বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

গাজী শরীফা ইয়াছমিন

[বাংলাদেশ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6) জনসংখ্যায় বিশ্বে অষ্টম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন ২০১৯ সালের উপাত্ত অনুযায়ী [এ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6) জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫৭ লাখ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৩%। এখানে শহরাঞ্চলে ২০১০-১৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩%। ভাবনার বিষয় হলো, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে শহরাঞ্চলে মানবসৃষ্ট বর্জ্য তৈরি হচ্ছে এবং সেসাথে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যবহার বা ভোগ করার পর অব্যবহারযোগ্য যে আবর্জনা তৈরি হয় সেগুলিকে বর্জ্য পদার্থ বলে। বর্জ্য সাধারণত কঠিন, তরল, গ্যাসীয়, বিষাক্ত ও বিষহীন- এই পাঁচ প্রকারের হয়ে থাকে। জীববৈচিত্র্য রক্ষা, সমস্ত জীবকূলকে রোগের হাত থেকে রক্ষা, পরিবেশ দুষণ ও অবনমন রোধের উদ্দেশ্যে আবর্জনা সংগ্রহ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পুনব্যবহার এবং নিষ্কাশনের সমন্বিত প্রক্রিয়াকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলা হয়। সাধারণত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় বর্জ্য বস্তুর উৎপাদন কমানো। সমন্বিত এবং সম্পূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনটি R নীতি প্রয়োগ করা হয়। তিনটি R নীতি হলো- Reduce (কমানো), Re-use (পুনব্যবহার) এবং Recycle (পুনশ্চক্রীকরণ) ।

জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ মহানগরী। বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে স্থানান্তরিত হওয়ার কারণে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সেসাথে বাড়ছে মানুষজনের তৈরি আবর্জনাও। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মূলত একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয় এবং ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে তা আরো বেশি চ্যালেঞ্জিং কারণ এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বাংলাদেশের মোট বর্জ্যের শতকরা ৩৭ ভাগ উৎপাদিত হয় রাজধানী ঢাকায় ৷ তাই এ শহরের ক্ষেত্রে বর্জ্য সংগ্রহ করে তা আবর্জনার স্তূপে পাঠিয়ে দেয়ার পরিবর্তে প্রয়োজন পরিকল্পিত সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।

এনভায়রমেন্ট অ্যান্ড সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসডোর) এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, করোনার কারণে সাধারণ ছুটি ঘোষণার একমাস পর উৎপাদিত হয়েছে প্রায় সাড়ে ১৪ হাজার টন প্লাস্টিক বর্জ্য। এর মধ্যে শুধু ঢাকায় প্রায় তিন হাজার ৭৬ টন যেখানে সার্জিক্যাল মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস এবং স্যানিটাইজারের বোতল এই বর্জ্যের নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়া এখানে ত্রাণ বিতরণে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের ব্যাগও ভূমিকা রেখেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৬ মার্চ থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত দেশে পলিথিন ব্যাগের বর্জ্য পাঁচ হাজার ৭৯৬ টন, পলিথিন হ্যান্ডগ্লাভস তিন হাজার ৩৯ টন, সার্জিক্যাল হ্যান্ডগ্লাভস দুই হাজার ৮৩৮ টন, সার্জিক্যাল মাস্ক এক হাজার ৫৯২ টন এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারের বোতল থেকে ৯০০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপাদন করেছে। ঢাকায় সর্বোচ্চ এক হাজার ৩১৪ টন সার্জিক্যাল হ্যান্ড গ্লাভসের বর্জ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া রাজধানীতে পলিথিন হ্যান্ডগ্লাভস ৬০২ টন, সার্জিক্যাল মাস্ক ৪৪৭ টন, পলিথিন ব্যাগ ৪৪৩ ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারের বোতল থেকে ২৭০ টন বর্জ্য উৎপাদিত হয়েছে।

বাংলাদেশের পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আইনি কাঠামো গড়ে উঠেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের উপর ভিত্তি করে। এছাড়াও জাতীয় সংসদে প্রণীত আইন, নিয়মাবলী, উপ-আইন ও বিভিন্ন বিধিমালা নিয়ে এ ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়ে থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ (১) ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, “জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন।” এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ২০১১ সালের ৩০ জুন পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ১৮ (ক) ধারা যোগ করা হয়। নতুন এই ধারায় বলা হয়েছে যে, “রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।”

বাংলাদেশে পৌর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সর্ম্পকিত যে সকল পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও আদেশ রয়েছে সেগুলো হলো- (১) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, (২) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (সংশোধিত), ২০০০, (৩) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (সংশোধিত), ২০০২, (৪) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (সংশোধিত), ২০১০, (৫) পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০, (৬) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭, (৭) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (সংশোধিত ফেব্রুয়ারি), ১৯৯৭, (৮) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (সংশোধিত আগস্ট), ১৯৯৭, (৯) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (সংশোধিত ২০০৫), (১০) পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ (সংশোধিত ২০১০)।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যেসকল বিধিমালা ও আদেশ রয়েছে সেগুলো হলো- (১) চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮, (২) বিপদজনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১, (৩) ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য হইতে সৃষ্ট বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৭ (খসড়া)।

বর্তমানে বাংলাদেশে শহরাঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। [ঢাকা সিটি কর্পোরেশন](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE_%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF_%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8) ও জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা (জাইকা) এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য Clean Dhaka Master Plan নামের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সোশ্যাল বিজনেস এন্টারপ্রাইজ ওয়েস্ট কনসার্ন, বাসাবাড়ি পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করছে। ইউনিসেফ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করেছে।

‘বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫’ অনুযায়ী ‘কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নীতিমালা’র খসড়া তৈরি করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করা বিষয়ে খসড়া নীতিমালায় একটি বিধান রাখা হয়েছে। বিধানে বলা হয়েছে, যদি কেউ জৈব ও অজৈব বর্জ্য আলাদা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদেরকে সর্বোচ্চ ২,০০০ টাকা জরিমানা করা হবে এবং একই কাজ পুনরায় করলে সর্বোচ্চ ৪০০০ টাকা জরিমানা করা হবে। বর্জ্যকে রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করতে নতুন নীতিমালা বিশেষভাবে সহায়তা করবে এবং দীর্ঘ মেয়াদে দেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখবে। দেশে কার্যকর রিসাইক্লিং শিল্প গড়ে তুলতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে ‘৩-আর প্রকল্প’ ও ‘৬৪ জেলায় কমপোস্টিং’ প্রকল্পসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সরকার অনেক প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ প্রতি বছর জাতিসংঘ ঘোষিত ‘বিশ্ব বসতি দিবস’ যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করে। ২০১৯ সালে বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো ‘Frontier Technologies as an Innovative Tool to Transform Waste to Wealth’ অর্থাৎ ‘বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার’। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে এই প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় আলোচ্য প্রতিপাদ্যের বিষয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে সকল নির্মিতব্য ভবনে সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও আবর্জনা ব্যবস্থাপনার সংস্থান রেখে ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ কে হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি আবাসন প্রকল্পসমূহে ‘সুয়েজ টিটমেন্ট প্ল্যান্ট’ এবং ‘সলিড ওয়েস্ট ডাম্পিং প্ল্যান্ট’ নির্মাণের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হয়েছে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্মিত ভবনগুলোতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সুয়েজ টিটমেন্ট প্ল্যান্টের সংস্থান করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভাসহ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত সকল সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, এনজিও’র সাথে সমন্বয় করে নগরের সৃষ্ট বর্জ্য রিসাইক্লিং করতে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

বর্জ্য নিয়ে প্রচলিত দুটো কথা হলো- আজকের বর্জ্য আগামীকালের সম্পদ এবং আবর্জনাই নগদ অর্থ। উন্নত দেশগুলোতে যেমন সুইডেন ও নরওয়েতে বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহারযোগ্য লাভজনক ভিন্ন বস্তুতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। এজন্য তারা অন্য দেশ থেকেও বর্জ্য আমদানিও করছে। বাংলাদেশেরও বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতো বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে বর্জ্য সংরক্ষণ, নিরপেক্ষায়ণ, নিষ্ক্রীয়করণ অথবা প্রক্রিয়াজাতকরণ করে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন নতুন জিনিস বানানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। এতে পরিবেশের সাথে সাথে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে দেশ ও দেশের মানুষ।

বাংলাদেশ সরকার রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ঢাকাসহ দেশের সকল বিভাগীয় শহরে কমিউনিটিভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাসাবাড়ি থেকে পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য পৃথকভাবে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বর্জ্য নিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও কম্পোস্ট সার তৈরির লক্ষ্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির সমন্বয়ে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করতে হবে। আর এভাবেই স্বল্প সম্পদের মাধ্যমে অধিক মানুষের চাহিদা পূরণ করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশেও নিশ্চয়ই এগিয়ে যাবে সে পথেই সফল সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে।

সর্বোপরি, আজকের শিশু দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই ছোটবেলা থেকেই শিশুদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে এবং এ শিক্ষা দিতে হবে পরিবার থেকেই। পরিবার থেকে যেখানে সেখানে ময়লা না ফেলার শিক্ষা শিশুদের ছোটবেলা থেকেই সচেতন হতে সাহায্য করবে। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে নির্দিষ্ট অধ্যায় সংযুক্ত করলে এবং গণমাধ্যমে যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনামূলক অনুষ্ঠান প্রচারসহ কার্যকর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে শিশুসহ আমাদের সকলকে সচেতন করে তুলতে হবে। আর এভাবেই নিরাপদ, সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করে যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলার চর্চা বন্ধ হবে ব্যক্তি থেকে বৃহত্তর পর্যায়ে।

-00-

(পিআইডি-শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম নিবন্ধ)